পুষ্টি বৈষম্য

ডা. তাসনুভা আহমেদ খান, সহযোগী অধ্যাপক

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। এছাড়াও সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশের সকল নাগরিকের কর্মক্ষম সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান (এসডিজি -১), ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান (এসডিজি -২) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার অপুষ্টি কি? অপুষ্টি হলো ম্যাক্রো অথবা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সেবনে ঘাটতি, নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় গ্রহণ বা ভারসাম্যহীনতার সাথে সম্পর্কিত একটি অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুষ্টি স্বল্পতা ও স্থূলতা এদুটোই অপুষ্টির ধরন। শিশু খর্বকায় বা শীর্ণকায় হওয়া এদুটোই পুষ্টি স্বল্পতার নির্দেশক। অপুষ্টির সাথে আরও কতগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়,যেমন ক্ষুধা, পরিমিত খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা ও তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। খাবার থেকে পর্যাপ্ত শক্তি না পাওয়ার কারণে সৃষ্ট একটি অস্বস্তিকর বা বেদনাদায়ক অনুভূতি। পরিমিত খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা হলো খাদ্য প্রাপ্তির সক্ষমতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, খাবার থেকে বাদ পড়ার বা খাবার শেষ হতে দেখার ঝুঁকি, পুষ্টিগত মান অথবা খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের সাথে আপস করতে বাধ্য করা। তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হলো খাদ্য শেষ হয়ে যাওয়া, ক্ষুধা অনুভব করা, একেবারে চরম অবস্থায় কোন কোন খাবার না খেয়েই এক বা একাধিক দিন পার করা।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি,শিক্ষা এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করছে। এগুলো বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এসডিজির মূলনীতি হলো কেউ পিছিয়ে থাকবে না, তার আলোকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যারা পিছিয়ে আছে তাদের চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার দেশের পুষ্টি বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসকল পদক্ষেপের ফলে পরিবারের গড় আকার কমে ৪.৩ এ দাঁড়িয়েছে,গড় প্রজনন হার ২.৩,স্তন্যপান করা শিশুর সংখ্যা ৯৮.৫,প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের হার বেড়েছে। মাঝারি ধরনের ও মারাত্মক পর্যায়ের খর্বকায় শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। বছরে দুই বার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে,এতে রাতকাণা রোগ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সাধিত হয়েছে । প্রায় সব পরিবারের ক্ষেত্রেই খাবার পানির সংগ্রহের উৎসের উন্নতি হয়েছে। গ্রামীণ ও শহরের পরিবারগুলোর মধ্যে এক্ষেত্রে পার্থক্য খুব সামান্য। এর মধ্যে ৪৩ শতাংশের ও বেশি জনগোষ্ঠী এমন এলাকায় বসবাস করে যেখানে তাদের আবাসস্থলেই পানির উৎস রয়েছে। তবে অনেক জায়গায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নতি হয়নি। সে সব জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকার সচেতন ভাবে সেগুলো নিয়ে কাজ করছে। শিশুদের সাথে সহিংস আচরণের হার আশঙ্কাজনকভাবে রয়ে গেছে। ১-৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় ৮৮ শতাংশই তাদের লালন-পালনকারীদের কাছ থেকেই সহিংস আচরণের শিকার হয়। বাল্যবিয়ে আমাদের সমাজে এখনো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদিও সরকারের নানামুখী কার্যক্রমের ফলে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তারপরও এটা গ্রহণযোগ্য মাত্রা থেকে অনেক বেশি। ৫-১৭ বছরের শিশুদের মধ্যে ৬ শতাংশের বেশি শিশু শ্রমের সাথে জড়িত। স্কুলে যাওয়া শিশুদের তুলনায় স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে এ হার অনেক বেশি। ৩৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে শৈশবকালীন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া শিশুর সংখ্যা কম। জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় এমন শিশুর সংখ্যা এখনো কম। স্বাস্থ্যকর আচারণের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস কমই রয়ে গেছে।

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে ন্যশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস) শীর্ষক ২৯ টি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূললক্ষ্য অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টিসেবা প্রদান। দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে কাজ করা। এছাড়াও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক,মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পুষ্টিহীনতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পূরক পুষ্টির প্রবর্তন এবং মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত এবং

চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুইশত পঞ্চাশটির ও বেশি মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি সেবা কেন্দ্র এবং চাশতটির ও বেশি শিশু বয়স কালের সমন্বিত সেবা কর্নার ও পুষ্টি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সমাজে পুষ্টি বৈষম্যতা রয়েছে। ঢাকা বিভাগের দারিদ্র্যের হার কম,অপরদিকে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্যের হার বেশি। খুলনা,বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহর অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার বেশি। হাওয়া, নদী ভাঙা,পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি। এসব অঞ্চলের মানুষের আয় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে পুষ্টি বৈষম্য দেখা যায়। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগের সুষম খাবারের ঘটিত রয়েছে, যেখানে ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম,জিংক এবং আয়রনের অভাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অপুষ্টি এড়াতে না পারলে স্থূলতা ও অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এসব কারণ সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বাংলাদেশের অগ্রগতি হুমকির মধ্যে পড়বে।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণের ও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। জাতীয় মাথাপিছু ক্যালরি প্রাপ্তির নিরিখে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের কারণে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও আমাদের বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান আয় এবং নগরায়ণের ফলে খাদ্য তালিকায় কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। করোনা অতিমারি কালে অব্যাহতভাবে সারাবিশ্বে খাদ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাসত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শিতার কারণে খাদ্য সংকট বা বিতরণ ব্যবস্থায় কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কিছু নেতিবাচক প্রবনতা যেমন ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসার,আয় বৈষম্য, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি মোকাবিলা করতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের মানুষ কখনো পরাজিত হয়নি। তাই সকলের সন্মলিত প্রচেষ্টায় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের পুষ্টি বৈষম্য দূর করে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

#

০৭.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার